2005

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৮৯৪)

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা গদ্য বিশেষ শিল্পমূর্তি লাভ করে। বঙ্কিমের পূর্ববর্তী গদ্যশিল্পীরা বাংলা গদ্যের ভাষা নির্মাণে দীর্ঘ প্রস্তুত ও অনুশীলনের পর্ব পেরিয়ে এসেছেন। বঙ্কিম এদের শিল্পসৃষ্টির প্রেরনা নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিতে বাংলা গদ্যকে ভাবজগৎ ও চিন্তাজগৎ এ বহু বিস্তীর্ন ক্ষেত্রে অবাধ সঞ্চারণের সুযোগ করে দিলেন। তাঁর হাতে বাংলা গদ্য নতুন খাতে প্রবাহিত হল, সৃষ্ট হল আদর্শ ভাষারীতি। বাংলা গদ্য রচনায় সংস্কৃতজ ও খাঁটি বাংলা শব্দ কি পরিমানে গ্রহনীয় এবং বর্জনীয় সে কথা বঙ্কিম ভালভাবেই বুঝেছিলেন। ফলে বাংলা গদ্যে উৎকৃষ্ট রীতি বলতে তিনি সহজবোধ্যতা ও সরলতার সঙ্গে সৌন্দর্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ১৮৭২ খ্রী: তাঁর সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনায় সাড়ম্বরে আবির্ভূত হলেন। তৎকালীন নবজাগ্রত বাঙালী মানুষের নানা মুখী আত্মজিজ্ঞাসা ও সমাজ জিজ্ঞাসা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রচেতনা এককথায় সমগ্র জীবন জিজ্ঞাসা, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর লেখনীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য মননশীলতা, যুক্তির তীক্ষ্নতা, তত্ত্ববস্তুর নিপুন আবিষ্কার ও বক্তব্য বিষয়কে সরসতামন্ডিত করবার দুর্লভ শক্তি। বঙ্কিম নিজে নানা বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং বাঙালী পাঠক সমাজকে সেই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ঊনিশ শতাব্দীর বাঙালী চিন্তা জগতে তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিনায়ক। তাঁর এই সমস্ত জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ বাঙালীর ঊনিশ শতকীয় নবজাগরণকে তরান্বিত করেছিল সন্দেহ নেই। বঙ্কিমের রচিত প্রবন্ধ অসংখ্য এবং বৈচিত্র্যে তা অসাধারন। আলোচনার সুবিধার্থে বঙ্কিমের প্রবন্ধকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে —

(১) সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ
(২) ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ
(৩) দার্শনিক প্রবন্ধ
(৪) সরস কৌতুকপূর্ণ রচনা / রসসন্দর্ভ জাতীয় প্রবন্ধ

(১) সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধঃ

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য বিচার পদ্ধতিতে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র পরিত্যাগ করে পাশ্চাত্যরীতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ [বিবিধ প্রবন্ধ'-এর ~~অন্তর্গত~~ দুইখণ্ড (প্রথম খণ্ড ১৮৮৭, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮২৯) প্রকাশিত হয়েছিল।] তাঁর লেখা 'উত্তর চরিত', 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রভৃতি প্রবন্ধ সমালোচনা সাহিত্যের আদর্শ রচনা স্বরূপ। তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার তিনি পথিকৃৎ। এ বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'শকুন্তলা', 'মিরন্দা ও দেসদিমোনা', এরই সঙ্গে তিনি কালিদাসের শকুন্তলা এবং শেক্সপীয়ারের মিরন্দা ও দেসদিমোনা এই তিনটি চরিত্র আলোচনা করে দিয়েছেন। কালিদাস মিলনান্ত নাটকের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, অন্যদিকে শেক্সপীয়র ~~ট্র~~ ট্র্যাজেডি নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী। বঙ্কিমচন্দ্র নিছক নীতি প্রচারকে সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করতে চাননি। তাঁর মতে সমাজের শেষ ~~লক্ষ্য~~ উন্নতি ও মানুষের চিত্তোন্নতির পথে। [যেমন রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য ও আনন্দকে সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য বলে নির্ধারিত করেছেন।]

(২) ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধঃ

এই ~~বিষয়~~ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল— (ক) বাঙ্গালার ইতিহাস, (খ) ~~বা~~ বাঙ্গালার কলঙ্ক, (গ) বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, (ঘ) বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, (ঙ) ভারত কলঙ্ক,

(চ) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং ~~পর্ব~~ পরাধীনতা।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশী লেখকের অসত্য ও অতিরঞ্জনের মধ্যে থেকে বাঙালীর অতীত ইতিহাসকে সন্ধান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে নবজাগরন হয়েছিল, যাকে চৈতন্য রেনেশাঁস যুগ বলে, সেটাই বাংলার প্রকৃত ইতিহাস—

> বাঙালীর সেই বিস্মৃত ইতিহাস কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে, যে বাঙালী তাহারেই লিখিতে হইবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।

যথার্থই কমলাকান্তরূপী বঙ্কিম ছদ্মবেশে বাঙালীর সেই ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বঙ্কিমের সমাজতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে সব অভিমত একালে পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না, কিন্তু এটুকু অনুভব করা যায় বঙ্কিমচন্দ্র দরিদ্র অন্ত্যজ বিষয়টি বিস্তৃত আকারে 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) ও 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮)-এ আলোচনা করেছেন। এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'সাম্য' (১৮৭৯)। যে আদর্শ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র বিচার করেছেন, সেই আদর্শ নিয়েই তাঁর 'ধর্মতত্ত্ব' সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন রীতিতে রচিত তত্ত্বগ্রন্থ। সেখানে গুরুশিষ্যকে নানা গুরুতর কথা বলেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

> সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই---- বিশ্বপ্রীতিই ঈশ্বরভক্তি ---- সকলের ধর্মের উপরে স্বদেশ প্রীতি ইহা বিস্মৃত হইও না।

(৩) দার্শনিক প্রবন্ধ :

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক যুগে ব্যবহারিক জীবনচর্চার দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি পাশ্চাত্য সমাজ দার্শনিক মিল, বেনথাম-এর জীবন জিজ্ঞাসা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। গুরুত্ব দিয়েছিলেন মানুষের সামাজিক কল্যাণের উপর, বঙ্কিম ~~বলেছিলেন~~ বলেছেন গীতা ও মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণই যথার্থ ভারত ঐতিহ্য ও ধর্ম সাধনার প্রতীক। বৈরাগ্যই জীবনের একমাত্র ধর্ম নয়, জীবনের পূর্ণ উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব, তাই যীশুখ্রীষ্ট ও বুদ্ধদেবের চেয়ে তিনি কৃষ্ণের জীবনাদর্শকেই পরমপুরুষার্থ বলে বিশ্বাস করতেন—

> যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগৎ এর ধর্ম প্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের ধার্মিকতা অসম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, গৃহী, যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী— আদর্শ পুরুষ নহেন।

রচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর' ~~অহিফে~~ অহিফেন সেবী কমলাকান্ত চক্রবর্তী এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। গ্রন্থটির তিনটি অংশ — (ক) কমলাকান্তের দপ্তর, (খ) কমলাকান্তের পত্র (গ) কমলাকান্তের জোবানবন্দী। ডি কুইন্সীর 'Confesson of an English Opium Eater' (১৮২২) গ্রন্থের সঙ্গে 'কমলাকান্তের দপ্তর'- এর কিছুটা সাদৃশ্য লক্ষণীয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রী:। বঙ্কিম নিজেও গ্রন্থটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করতেন।

(৪) রসসন্দর্ভ জাতীয় রচনা ঃ

বঙ্কিমের কিছু নিবন্ধ ~~ক~~ গল্প ও কৌতুক রচনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অনেক সময় তাঁকে 'বঙ্গদর্শন'-এর জঠর পূর্তির জন্যে নানা শ্রেণীর প্রবন্ধ, নিবন্ধের আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫)-এ সহজ ও সরস ভাষায় প্রাথমিক বিজ্ঞানচর্চা, ছাত্র সমাজই এর প্রধান কথা, সরস ভঙ্গিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধের আকারে সমগ্র বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি কৌতুকরস, ব্যঙ্গবিদ্রূপ অবলম্বন করে লেখেন 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) - দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৮৮), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫), 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪)। এর মধ্যে ~~সেইত~~ মানুষের দুঃখ বেদনাও হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে বাংলার কৃষি সমাজ শোষিত নিপীড়িত হয়। এই আলোচনা এতই সূক্ষ্ম যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ না হয়েও তা ইতিহাসেরই সমতুল্য।

বিষয়ের ব্যাপকতা, আলোচনার গভীরতা, যুক্তিবাদী এবং পরিচ্ছন্ন গদ্য ভাষা বঙ্কিমের প্রাবন্ধিক সত্তার প্রধান লক্ষণ। ভাষার স্বচ্ছতা ও প্রত্যক্ষগামিতা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। বলা যেতে পারে বঙ্কিমের ভাষাই বাংলা প্রবন্ধের আদর্শ ভাষা। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে যে যৌবনাবেগ লক্ষিত হয়, তাতে বাঙলা গদ্যের নবজন্ম এবং প্রবন্ধ রচনার একটি সমৃদ্ধ ধারার সূচনা হয়।

৪) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা কর।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন রাজা রামমোহন রায় বাংলা গদ্যকে নিমজ্জন দশা থেকে উদ্ধার করে মাত্র গ্রানাইট স্তরের ওপর স্থাপন করেছিলেন, বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহনের অবদান আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়ে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উইলিয়াম কেরী, জন মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারী গন এবং রাম রাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ বাঙালী পন্ডিতদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আধুনিক বাংলা গদ্যের গোড়াপত্তন হয়। কিন্তু এদের রচনা রীতির মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না। দেশি, বিদেশী প্রচলিত উপকথা, আধ্যাত্মিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মধ্যেই ~~বাংলা~~ বাংলাগদ্য সীমাবদ্ধ ছিল। বিদেশি রাজশক্তির স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই নিছক পাঠ্য গ্রন্থ ও খ্রিষ্টান ধর্মের উপদেশমূলক গদ্য রচনা উক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

রামমোহন রায় প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রয়োজন নিরপেক্ষ, যুক্তিনিষ্ঠ, বিচার প্রবীন গদ্য রচনা প্রকাশ করেন। রামমোহন রায়ের যুগান্তকারী প্রতিভা চিহ্নিত রচনাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিচার বিতর্কমূলক প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। ১৮১৬ - ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

রামমোহনের রচনা মূলত বিতর্কমূলক রচনা। ইংরাজী, হিব্রু, বাংলা, ল্যাটিন, আরবি, ফার্সি, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় সুপন্ডিত ও শাস্ত্র বিশারদ রামমোহন মূলত বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি তার ধর্ম ও তত্ত্বাশ্রিত প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। শাস্ত্র থেকে যুক্তি, তর্কের সাহায্য নিয়ে তিনি হিন্দু ধর্মের

প্রচলিত মূর্তি পূজার অসারতা প্রমাণ করেন। খ্রিষ্টান ধর্ম সম্প্রদায়ের হিন্দুর ধর্ম বিরোধী মতামতেরও কঠোর সমালোচনা করেন তিনি। তার সকল আলোচনাই ছিল যুক্তিভিত্তিক। এই সকল রচনাতেই যুক্তিবাদী ও আত্মপ্রত্যয়শীল রামমোহনের প্রখর ব্যক্তিত্ব অনুভব করা যায়। সেই কারনে সমসাময়িক অন্য লেখকদের রচনা থেকে রামমোহনের রচনায় স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করতে অসুবিধা হয় না।

রামমোহনের রচনাগুলিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। ধর্ম ও তত্ত্বমূলক আলোচনা এবং সামাজিক আচার বা প্রথা বিষয়ক রচনা। রামমোহন রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হয় তখন তার বয়স ছিল ৪১ বছর। জীবনের পরবর্তী ১৮টি বছরের তিনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে শক্ত ভিতের উপর স্থাপন করেছিলেন।

একেশ্বরবাদের সপক্ষে রামমোহনের প্রথম রচনা 'বেদান্ত-গ্রন্থ' (১৮১৫) ও 'বেদান্তসার' (১৮১৬)। পুস্তিকা দুটি অনুবাদ হলেও গুরুত্বের দিক থেকে মৌলিক রচনারই সমান। বিশেষত বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকায় সমকালীন বাংলা গদ্য ভাষার অপুষ্টতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রামমোহন বাংলা বাক্য গঠন বিধির আদর্শ সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। নিম্নলিখিত অন্যান্য গ্রন্থ সমূহে রামমোহন প্রধানত ধর্ম বা তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা করেছেন —

১) 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭),
২) 'গোস্বামীর সহিত বিচার' (১৮১৮),
৩) 'কবিতাকারের সহিত বিচার' (১৮২০)
৪) 'ব্রাহ্মন সেবধি ও ব্রাহ্মন মিশনারী সম্বাদ (১৮২১),
৫) 'চারি প্রশ্নের উত্তর' (১৮২২),
৬) 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ' (১৮২৩),
৭) 'গুরুপাদুকা' (১৮২৩)
৮) 'ব্রাহ্মোপাসনা' (১৮২৮) ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়াও তিনি সংস্কৃত উপনিষদ যেমন 'কেনোপনিষদ' (১৮১৬), 'ঈশোপনিষদ' (১৮১৬), 'কঠোপনিষদ' (১৮১৭), 'মুণ্ডকোপনিষদ' (১৮১৯) ইত্যাদি অনুবাদ করেন।

শাস্ত্র সমর্থিত সামাজিক আচার ব্যবহার অবলম্বন করে লিখিত রামমোহনের মৌলিক রচনারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

১) সহমরন বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (১৮১৮).

২) সহমরন বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯).

৩) 'সুব্রহ্মন্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' (১৮২০)

৪) 'পথ্য প্রদান' (১৮২৩)

৫) 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার. (১৮২৬)

৬) সহমরন বিষয় (১৮২৯).

রামমোহন বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য রচনা করেন 'গৌড়ীয় ব্যাকরন' (১৮৩৩). এটি বাঙালীর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরন. অবশ্য এরপূর্বে তিনি ইংরেজদের বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে "Bengali Grammar in English language" (১৮২৬) - রচনা করেন. তবে 'গৌড়ীয় ব্যাকরন'ই অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ. চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই গ্রন্থে রামমোহন বর্ন, তাদের উচ্চারন পদ্ধতি, লিঙ্গ, প্রত্যয়, কারক, বিভক্তি, সমাস, ছন্দ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন.

সংবাদপত্র সম্পাদনা ও প্রকাশেও তিনি অগ্রনী ছিলেন. ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীচরন বন্দ্যোপাধ্যায় - এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রকাশ করেন 'সংবাদ কৌমুদী', এছাড়া রামমোহন ইংরাজী ভাষায় "Brahmunical Magazine" (১৮২১) বাংলা ভাষায় প্রথম সেবধি এবং ফার্সি ভাষায় "মীরাতুল আকবর" (১৮২২) পত্রিকা প্রকাশ করেন.

রামমোহনের গদ্য রচনা মূলত আবির্তক. তাঁর ভাষা বিতর্কের ভাষা. সেই ভাষার অর্থ আছে কিন্তু আবেগ বা ব্যঞ্জনা নেই. রামমোহন বাংলা গদ্যকে যুক্তিতে তর্কে চিন্তায় সজ্জিত করে আধুনিক মানের উপযোগী করে তোলে. তিনি প্রথম দেশীয় রক্ষনশীল হিন্দু সম্প্রদায় ও বিদেশি খ্রিষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়ে বাংলা ভাষায় বিতর্কমূলক আলোচনায় সূত্রপাত করেন. বাংলা ভাষায় যখন শৈশব অবস্থা, রামমোহনকে নিজের প্রয়োজন অনুসারেই বিভিন্ন সময়ে ভাষা তৈরী করে নিতে হয়েছিল. অপরিনত অস্পষ্ট ভাষার মধ্য দিয়ে নীরস তত্ত্বমূলক বিষয়ক আলোচনা যে কতখানি কঠিন তা অনুমান করা যায় তা সত্ত্বেও রামমোহন নিজের যুক্তি ও চিন্তাকে দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন.

আমাদের মনে রাখতে হবে রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না, ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তিনি যতটা না সাহিত্যিক ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমানে ছিলেন সংস্কারক. বিরামচিহ্নহীন বাংলা গদ্যকে অর্থ অনুযায়ী দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতির সাহায্যে তিনি বাঙালীকে গদ্যপাঠের রীতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রামমোহনের গদ্য সম্পর্কে বলেছেন — " দেওয়ানজি (রামমোহন) জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন ..... কিন্তু সে লেখায় শব্দের পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টতা ছিল না"। রামমোহনের গদ্যে সাবলীলতা ও সরসতার প্রকান্ড অভাব তাকে বিতর্ক যুক্তিবাদের লেখকে পরিনত করেছে, প্রথম শ্রেনির প্রাবন্ধিকদের মর্যাদা দিতে পারেনি।

রামমোহন সৃষ্টি করেছেন বিতর্কের ভাষা, মননের ভাষা। সেই দার্শনিক চিন্তায় বলিষ্ঠতা আছে কিন্তু সেই ভাষায় আবেগ ও রস সৌন্দর্য নেই। মাত্র দু-এক স্থলেই রামমোহনের ভাষায় সরসতার সঞ্চার হয়েছে। এতে প্রমানিত হয় যে সাহিত্যিক গদ্য লেখার ক্ষমতা তার ছিল কিন্তু ব্যাবহারিক প্রয়োজনের প্রতি অতিরিক্ত লক্ষ্য রাখাই তার গদ্যে শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ রসসৃষ্টিতে সমর্থ হয়নি।

প্রাবন্ধিক : অক্ষয় কুমার দত্ত

"আমাদের বাল্যকালে আমরা একটি নতুন যুগের অবতারণা দেখেছি। প্রাচীন পাণ্ডিত্যের সঙ্গে য়ুরোপীয় বিচার পদ্ধতির সম্মিলনে এই যুগের আবির্ভাব। অক্ষয় কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রথম সূত্রপাত দেখা গিয়েছিল।"

— এমনটাই লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুত:, রাজা রামমোহন রায় থেকে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা প্রবন্ধের যে ধারা প্রবাহিত ছিল, তার রূপ ও রীতিগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয় অক্ষয় কুমার দত্তর হাত ধরেই (১৮২০-১৮৮৬)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা'র (১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) মুখপত্র — তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (১৮৪৩ খ্রী:) সম্পাদক ছিলেন তিনি। বাংলা গদ্যের বিকাশে এই পত্রিকার একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। অক্ষয় কুমার দত্ত ছিলেন বিজ্ঞান বিষয়ে কৌতূহলী, বিজ্ঞানের আলোচনায় আগ্রহী। পশ্চিমের দেশ থেকে বিজ্ঞানের বার্তা সবে এ দেশে পৌঁচেছে। অক্ষয় কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায়, তার সুগভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা সেই ইউরোপীয় বিচার পদ্ধতি'র — 'Indianishing' ঘটিয়েছিলেন।

বিষয় বৈচিত্র্যে অক্ষয়কুমারের রচনা বিপুল। নীতি, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি একাধিক বিষয়ে লিখিত তার গদ্য রচনার কাল ১৮৪১ থেকে ১৮৮৩ খ্রী: পর্যন্ত প্রসারিত। এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরে রচিত আটখানি গ্রন্থের প্রকাশ কাল যথাক্রমে —
ভূগোল – ১৮৪১ ; ডেভিড হেয়ারের নাম স্মরনার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক বক্তৃতা (১৮৪৫)
বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার – প্রথম ভাগ (১৮৫১) দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩)
বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ (১৮৫৫) ; ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫)
ধর্মনীতি (১৮৫৬) ; চারুপাঠ – প্রথম ভাগ (১৮৫৩) দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৪) তৃতীয় ভাগ (১৮৫৯) ;
পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬) ; ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম ভাগ (১৮৭০) দ্বিতীয় (১৮৮৩)

আমরা খুব সংক্ষেপে এখানে অক্ষয় দত্তের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করব।

ভূগোল (১৮৪১) অক্ষয় কুমারের প্রথম গদ্যগ্রন্থ। বাঙালী রচিত, বাংলা ভাষায় লিখিত ভূগোল বই এর পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। বহু ইংরাজী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে — বালকদের বোধগম্য সুশিক্ষাযোগ্য এই পুস্তক তিনি প্রনয়ন করেন।

১৮৪৫ খ্রী: অক্ষয় কুমারের দ্বিতীয় গ্রন্থ ডেভিড সাহেবের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মধ্যে এটিই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। বইটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে 'বেঙ্গল হরকরা' সংবাদ দিয়েছেন —

The subject of it was the changes effected by the agency of Education in the Hindu mind. (7th June, 1845)

অক্ষয় কুমার দত্তের তৃতীয় গ্রন্থ – বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১৮৫১ ও ১৮৫৩) এই বইটি উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত নরকোটিবিদ (Phrenologist) George Combe এর লেখা The Constitution of Man Considered in Relation to External Objects – গ্রন্থের অনুসঙ্গে লেখা হয়েছে। আমিষ খাদ্যের অপকারিতার সমর্থন (বা). বাহ্যজগতের সাথে মানবজীবনের পারস্পরিক প্রাকৃতিক সম্পর্কের বিশদ বিশ্লেষনই মূলত বইটির উপজীব্য। পশ্চিমী তত্ত্বমূলক গ্রন্থ থেকে বিষয়টিকে আমাদের জাতিচেতনার উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন তিনি। অক্ষয় কুমার নিজেই লিখেছেন —

ইহা ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সমধিক ও উপকারজনক, কিন্তু

এ দেশীয় লোকের পক্ষে সে রূপ নহে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে।

অক্ষয় কুমারের পরবর্তী পুস্তক 'চারুপাঠ'। এটি নীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ক সঙ্কলন গ্রন্থ এবং উনিশ শতকের অন্যতম বহুল প্রচলিত ছাত্রপাঠ্য পুস্তক। এই পুস্তক সম্পর্কে রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন -

" ইহার পূর্বে বিশ্বের নিয়ম ও বস্তুর পদার্থ সংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই।

পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬) অক্ষয় কুমারের আর একটি উল্লেখযোগ্য ছাত্রপাঠ্য পুস্তক। কয়েকটি রচিত প্রথম বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই ~~একটি~~ এটি। 'জড় ও পদার্থ' 'পরমাণু' 'আকর্ষণ', 'প্রবাহ' প্রভৃতি পদার্থবিদ্যা বিষয়ক একাধিক আলোচনা ও ~~ত~~ তার সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

অক্ষয় কুমারের সাহিত্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' এইচ. এইচ. উইলসনের Sketch on Religious Sects of the Hindus অনুকরণে এই বই তিনি রচনা করেছিলেন। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে বৈদিক ধর্মের প্রচলন, বৈদিক ধর্মের পর হিন্দু সম্প্রদায়ে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মের প্রসার, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসনা প্রণালী প্রভৃতি অতি নিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির আলোকেই প্রধানত: অক্ষয় কুমারের মানসিক চেতনা পরিপুষ্ট হয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞান মূলক একটি বিশেষ বক্তব্য ছিল অক্ষয় কুমারের, তার বাচনভঙ্গীর মধ্য দিয়ে সেই বাচ্য বিষয়কে তিনি পাঠক মনে অসংশয়িত প্রতিষ্ঠা দিতে ~~সক্ষম~~ পেরেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তার বাচনভঙ্গী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন

" এমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। "

ভাষার এই সৌষ্ঠব আসলে অক্ষয় কুমারের ব্যক্তিত্বের দীপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরাজী ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য; বিজ্ঞান; পুরাবৃত্ত, রাজনীতি ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ ~~জ্ঞ~~ জ্ঞান এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেদিনকার নাগরিক বাংলার জ্ঞান মনীষার সান্নিধ্যই হয়তো তার মধ্যে এনে দিয়েছিল এই দীপ্তি। রমেশ চন্দ্র দত্ত মন্তব্য করেছেন -

In Akshaykumar's style we admire the vehemence and force of the mountaing torrent in its wild and rugged beauty. Vidyasagar is more accomplished master of style, Akshaykumar is the more forcible preacher.

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কালে নবসৃজ্যমান বাংলা গদ্য অক্ষয় দত্তের হাতে এক নতুন পরিণতির দিগন্তরেখা আবিষ্কার করতে পেরেছিল। ঈশ্বর চন্দ্র বাংলা গদ্যকে দিয়েছিলেন মাধুর্য ও শিল্পসুষমা, অক্ষয় দত্ত দিলেন যুক্তিবিচারে সমৃদ্ধ ভার বহনের ক্ষমতা — যার শক্তি বলে বাংলা গদ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন হতে পারে সহজে। সে ভাষার কেবল ঋজু নয়, মসৃণ ও সাবলীলও।

অক্ষয় কুমারের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তার ভাষায়। তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তি অবলম্বন করে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার ফলে প্রত্যাশিত লাবণ্য তার ভাষায় নেই; পরিবর্তে একধরনের কাঠিন্য তার রচনাকে গ্রাস করেছে। এই কাঠিন্য অবশ্যই রামমোহনের কালের ভাষার কাঠিন্য নয়। ভাষার ওজস্বিতার সঙ্গে সঙ্গে আংশিক প্রাঞ্জলতা গুণও বর্তমান তার রচনায়। সাহিত্য বিষয়ক এবং নীতি বা ধর্ম বিষয়ক রচনায় তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার তিনি করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাগুলিতে তুলনামূলক ভাবে তৎসম শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা তাঁর অনেক কম।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয়কুমারের রচনা কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তন সূচীত করেছিল। অক্ষয় কুমারই প্রথম বিজ্ঞান ইতিহাস, জীবন-চরিত, রাজনীতি সমাজ দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করে ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য ঘটিয়েছিলেন। তাঁর রচনার সূত্র ধরেই আমরা বিতর্কমূলক রচনার ধারা থেকে একোক্তি মূলক প্রবন্ধ রচনায় পৌঁছে গেলাম। উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক আলোচনা নয়, স্বল্প পরিসরে যুক্তি বা তথ্য সমন্বিত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি বাংলা প্রবন্ধকে আর এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। ভাষার কাঠিন্য সত্ত্বেও বাংলা প্রবন্ধের একটা নতুন মডেল আমরা পেয়ে গেলাম এই প্রাবন্ধিকের কাছে।

Date:- 23.6.11

1) স্বামী বিবেকানন্দঃ- (প্রাবন্ধিক)

Ans) বাংলাদেশের অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীষীদের মধ্যে অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং এই বিশিষ্ট নামেই তিনি স্বদেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর কাছে তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন. বাংলা ছাড়াও সংস্কৃত ইংরাজি ও ফরাসিভাষায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রেও তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, বিবেকানন্দ প্রধানত ইংরাজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি কয়েকটি ধর্মীয় কবিতা রচনা করেন। বাংলা ভাষাতে বিবেকানন্দ গদ্য কবিতা ও সংগীত ছাড়াও বেশ কিছু প্রবন্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

বিবেকানন্দের মৌলিক প্রবন্ধগুলি হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (1902), বর্তমান ভারত (1905), ও পরিব্রাজক (1905) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বিবেকানন্দের বিভিন্ন বিষয়ে রীতি রচনার সংকলন "ভাববার কথা" (1907) গ্রন্থ ও তাঁর কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ রয়েছে, এছাড়াও বাংলা ভাষায় লিখিত বিবেকানন্দের বহুচিঠি "পত্রাবলী" নামে প্রকাশিত হয়েছে, এইসব পাঠের কল্যাণে বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তা ও ব্যক্তিত্বের স্বদেশ প্রেমের সন্ধান পেতে পারি

তাঁর "বিলাত যাত্রী" পত্র চারটির অধিকাংশ চিঠিই সরল প্রবন্ধধর্মী। বিবেকানন্দের বেশিরভাগ রচনাই "উদ্বোধন" ও "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় প্রকাশিত হত।

বিবেকানন্দের বিভিন্ন প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থাই প্রধানত আলোচিত হয়েছে। ভাষা ও রচনা-রীতির দিক থেকে সব প্রবন্ধই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। বিবেকানন্দের গদ্যভাষা কখনও গুরু-গম্ভীর কখনও বা অতিচপল অথচ দ্রুত গতিশীল। তিনি অন্তর্ধর্মী বিশ্লেষণ বহু সমাসযুক্ত বাক্যবিন্যাসে যেমন দক্ষ তেমনি অনায়াসে চলিতভাষা ব্যবহারেও সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি সাহিত্যকর্মে সর্বদাই চলিতভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই চলিত ভাষায় লেখা। চলিত ভাষার সমর্থনে বিবেকানন্দ লিখেছেন — "স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ, দুঃখ, ভালোবাসা জানাই তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না। সেই ভাব সেই ভঙ্গি সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে।" বিবেকানন্দ চলিত কথ্য ভাষার যথার্থ প্রাণশক্তি অনুভব করেছিলেন। কেবলমাত্র ক্রিয়াপদ, বিশেষণ, সর্বনামের কথ্য রূপের ব্যবহার নয়, প্রচলিত

অনুশীলনের প্রকাশ করেছেন।

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" গ্রন্থে বিবেকানন্দের গভীর মননশীলতা, বিশ্লেষণ শক্তি ও জাগতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় জাতির সভ্যতা, জীবনাদর্শ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধগ্রন্থে। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজপুরুষ ও সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে যে পারস্পরিক ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব বর্তমান ছিল তার একটি নিখুঁত চিত্র স্বামীজীর রচনায় ফুটে উঠেছে এবং বৈষম্য সত্ত্বেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনেই বিবেকানন্দের আগ্রহ ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েরই উভয়কে প্রয়োজন একই সঙ্গে মানুষের জীবনে ধর্ম শিক্ষা ও জাগতিক উন্নতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনের বিষয়টি গভীর ভাবে অনুভব করা বিবেকানন্দ ছাড়া আর কোন সাধু সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

স্বামীজীর "পরিব্রাজক" গ্রন্থটি ভ্রমণকথা বিষয়ক হলেও তা ভ্রমণবিলাসীর আত্মবিবরণী ও ভাববিলাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিবেকানন্দ পৃথিবীর বহু স্থান পর্যটন করেছিলেন এবং বিভিন্ন দেশের উন্নতি, অগ্রগ-

পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন, "পরিব্রাজক" গ্রন্থটি মূলত ভারতবর্ষের প্রাচীন সমৃদ্ধ ও রূপসৌন্দর্য এবং সাংস্কৃতিক গৌরব পরিব্রাজকের বিকশিত চিন্তা ও ভাবনা-সমৃদ্ধ। বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, চলিত ভাষার সহজ লালিত্যেই গ্রন্থে রসোজ্জ্বল ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, প্রমাণিত বিবেকানন্দ যে সৌন্দর্যসন্ধানী এবং কবিমনেরও অধিকারী ছিলেন এই গ্রন্থ পাঠ করলে তা সহজেই বোঝা যায়।

বিবেকানন্দের রাষ্ট্রনৈতিক ও ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় তাঁর "বর্তমান ভারত" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবর্ষে পরাধীনতার প্রেক্ষাপটে স্থাপিত বর্তমান ভারতের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। প্রজাকে দুর্বল করে কোন রাষ্ট্রশক্তি দীর্ঘকাল শাসনভার রাখতে পারে না, একদিন তার বিদায়গ্রহণের পালা আসবেই, স্বামীজী আলোচ্য প্রবন্ধ গ্রন্থে যুক্তি শৃঙ্খলা ও তথ্য প্রমাণের দ্বারা এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবে ভারতবর্ষে এক দ্বন্দ্ব-জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়, ভারতীয় সনাতন জীবন ধারার এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির

সম্পর্কে যেগুলো তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে। বিবেকানন্দ আধুনিক চলিত ভাষারও পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু তাঁর বর্তমান ভারত প্রবন্ধটি বিশেষণ বহুল সমাসযুক্ত সাধুভাষায় লিখিত হয়েছে।

বিবেকানন্দ বিশুদ্ধ শিল্পস্রষ্টার অনুপ্রেরণায় কোনো রচনাকর্মে নিযুক্ত হননি। নিছক সাহিত্যস্রষ্টার জন্য যে অখণ্ড নিষ্ঠা ও একাগ্রতা প্রয়োজন তা তাঁর বিচিত্র কর্ম-বহুল, স্বল্পপরিসর জীবনে সম্ভব ছিল না। স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি ও স্বধর্মপ্রীতি তাঁর সমস্ত রচনার মূল প্রেরণাস্বরূপ ছিল। তিনি তথাকথিত সাধারণ সন্ন্যাসী বা ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। ভারতবর্ষের উন্নতি ও অগ্রগতি ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। তাঁর বাংলাভাষায় লিখিত প্রবন্ধগুলি ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক, সামাজিক অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ জটিল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান যে গভীর ধর্মচেতনা ও অভিনব ধর্মাদর্শের সহায়তায় সম্ভব বিবেকানন্দ তাঁর "বিবিধ প্রবন্ধ"-এর মাধ্যমে সেই আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। চলিত ও সাধু উভয় প্রকার গদ্য ভাষা তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বিবেকানন্দের —

প্রায় সমস্ত প্রবন্ধই মহান আদর্শ প্রচারের দৃঢ় প্রত্যয় ও গভীর ভাবরাজিতে সমৃদ্ধ। শব্দবিন্যাসের পারিপাট্যে, ভাব ও ভাষার সহজ সামঞ্জস্যে এবং অল্প কথায় গভীর ভাবপ্রকাশের ক্ষমতায়—বিবেকানন্দের প্রায় সকল প্রবন্ধই সুতীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

খ) গদ্যকার প্যারীচাঁদ মিত্র :—

বাংলা গদ্যের উন্নয়ন পর্বের যে সমস্ত গদ্যকারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে স্মরণীয় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন নবীন কবিতার জন্মদাতা প্যারীচাঁদ মিত্র তেমনি নবীন উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। বেতাল পঞ্চবিংশতি বা আরোব্য উপন্যাসের বাইরেও যে গল্পরস আছে তা প্রথম প্যারীচাঁদই দেখিয়েছিলেন তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে। বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় প্যারীচাঁদ মিত্র প্রকাশ করেছিলেন 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪)। লেখ্য ও মুখের ভাষার মিশ্রণ ঘটানোই ছিল মাসিক পত্রিকার প্রধান বিশেষত্ব। সংস্কৃত বহুল গুরুগম্ভীর সাধুভাষার বিরুদ্ধাচরণ করে বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম চলিত অর্থাৎ কথ্য ভাষার প্রবর্তনের জন্য প্যারীচাঁদ মিত্র ও তাঁর সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত প্রধান গ্রন্থগুলি হল — 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামা রঞ্জিকা' (১৮৬০), 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০), 'বামাতোষিণী' (১৮৮১)।

আলালের ঘরে দুলাল :— প্যারীচাঁদ মিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত রচনা "আলালের ঘরে দুলাল"। কুশিক্ষা ও অসৎ সঙ্গে এবং অভিভাবকের প্রশ্রয় ও অমনোযোগিতায় ধনীর দুলাল মতিলালের অধঃপতন এবং পরে অনেক দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার পর সৎ জীবনে ফিরে আসার কাহিনি এই রচনায় বর্ণিত হয়েছে। কাহিনির মধ্যে নীতিবাদের প্রচার লক্ষণীয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষই এখানে স-মহিমায় উপস্থিত। প্রেমনারায়ন মজুমদার, কবিরাজ ব্রজনাথ রায়, মৌলভি, উৎকল দেশের পণ্ডিত, আদালতের ঘুষখোর পেশকার, ভণ্ড শিক্ষক বক্রেশ্বর, ঠকচাচা — প্রত্যেকেই প্যারীচাঁদের তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতার আলোয় উদ্ভাসিত। বিশেষ করে জীবন্ত ঠকচাচা এই রচনার অন্যতম উজ্জ্বল চরিত্র।

'আলালের ঘরে দুলাল' বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস কিনা এবিষয়ে বিতর্ক আছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র একে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ সমালোচক একে প্রথম সার্থক উপন্যাস বলতে রাজি নন। খাপছাড়া প্লট, নানা অবান্তর ঘটনায় মূল কাহিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়া, চরিত্র সৃষ্টিতে অপটুতা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভাব — প্রভৃতি কারণে এই রচনায় সার্থক কথা-সাহিত্যের ~~লক্ষণ~~ লক্ষণ ফুটে উঠতে পারেনি। তবে একথা স্বীকার্য যে 'আলালের ঘরে দুলালে' প্রথম বাংলা উপন্যাসের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল।

মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায় :— এই গ্রন্থটিতে দুটি "নকশা" জাতীয় রচনা রয়েছে। এর প্রথম কাহিনীতে (মদ খাওয়া বড় দায়) মদ্যপানের দোষ এবং দ্বিতীয় কাহিনীতে (জাত থাকার কি উপায়) রক্ষণশীল সমাজে জাত পাতের কু-সংস্কার তুলে ধরা হয়েছে। প্যারীচাঁদ এই রচনাগুলিতে সমাজ-সংস্কারের মনোবৃত্তি নিয়ে কলম ধরেছেন। বিশেষ করে দ্বিতীয় কাহিনীতে সমাজের নেতৃবর্গ এবং ধর্মরক্ষকদের নীতি হীন চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

রামারঞ্জিকা :— এই গ্রন্থটি সংলাপের ভঙ্গিমাতে লেখা। এটি ২০ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। পতি-পত্নীর কথোপকথনের মাধ্যমে নারী জাতির সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার নানা প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদ, মহাভারত ও নানা পুরাণ গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

যৎকিঞ্চিৎ :— প্যারীচাঁদ রচিত 'যৎকিঞ্চিৎ' ২০টি ~~অধ্যায়~~ অধ্যায়ে বিভক্ত। ঈশ্বর তত্ত্বমূলক একটি দার্শনিক প্রবন্ধ গ্রন্থ। জ্ঞানানন্দ এবং রামানন্দের কাহিনির মধ্য দিয়ে প্যারীচাঁদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের নিয়ম, আত্মার অবিনাশত্ব, ঈশ্বর উপাসনার পদ্ধতি ইত্যাদি জটিল তত্ত্বকথা ব্যক্ত করেছেন।

অভেদী :— প্যারীচাঁদ মিত্র এই রচনাটিকে নিজেই ~~Spri~~ Spiritual Novel বা আধ্যাত্মিক উপন্যাস আখ্যা দিয়েছেন। এই রচনায় আধ্যাত্মিকতার দিকে পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন তিনি। উপন্যাসের নায়ক অন্বেষণ চন্দ্র। তাঁর স্ত্রী পতিভক্তিনী-

এখানে রূপকের স্থলে নিষ্কাম প্রেম ও আধ্যাত্মিক সাধনার- উচ্চ আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে।

বামাতোষিনী :— নারী কল্যাণ মূলক গ্রন্থ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র গোপাল, স্ত্রী শান্তিদায়িনী, কন্যা ভক্তিভাবিনী এবং পুত্র কুলপাবন। পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা, শিশু ও স্ত্রী শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে নীতিবাদী কাহিনি গড়ে তোলা হয়েছে এই রচনায়।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা :— এটি- এটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল— 'ব্রহ্মবাদিনী—', 'আর্যরাজ্য', 'স্ত্রীলোকদিগের সম্মান', 'পুনর্বিবাহ', 'সহমরণ ও ব্রহ্মচর্য', 'বৌদ্ধমত', 'চৈতন্য' ইত্যাদি।

গুরুত্ব বা মূল্যায়ন :— [1] প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনাতে প্রথম বাংলা উপন্যাসের পদধ্বনি শোনা যায়।

[2] প্যারীচাঁদ মিত্রের সার্থক কৃতিত্ব বাংলা ভাষার পরিবর্তন সাধন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতি গদ্য-রীতি বর্জন করে প্যারীচাঁদ সাধু ভাষাকে কথ্য ভাষার সাথে মেলাতে চেষ্টা করলেন।

[3] প্যারীচাঁদ সৃষ্ট এই নতুন ভাষারীতির নাম দেওয়া হয়েছে 'আলালী' ভাষা। এই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল — বাক্যরীতির কথ্য ভঙ্গি, ভাষায় তীব্র শ্লেষ ও কৌতুকরস, আরবী - ফার্সি শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ, ক্রিয়া-

বিভক্তি, কারক-বিভক্তি ও অব্যয়ের নতুন রূপ আবিষ্কার ইত্যাদি।

৪ তবে একমাত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থেই প্যারীচাঁদ এই ধরনের ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। তাঁর পরবর্তী রচনাগুলিতে কথ্যরীতি ত্যাগ করে তিনি ক্রমশ জটিল ভাষাভঙ্গি ব্যবহার করেছেন।